শিশুদের অধিকার
ও
আমাদের করণীয়
(অভিভাবক ও স্কাউটার)

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children
Sweden-Denmark

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা :

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ১৯৯৪ সাল থেকে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশুদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্কাউটস ও শিশুদের চারিত্রিক গঠন, বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও বাংলাদেশ স্কাউটস তোমাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যৌথভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রত্যেক সদস্যই নিজেকে গড়ে তোলার পাশাপাশি বন্ধু, সহপাঠী ও ছোট ভাইবোনদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে থাকে, যা মূলত সমাজ উন্নয়নেরই অংশ। অতএব, শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং স্কাউটসদের তথা শিশুদের সুরক্ষিতকরার জন্য ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু কারা বা শিশুর বয়সসীমা কত বছর :

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ০ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবাই শিশু।
- জাতিসংঘ 'শিশু অধিকার সনদ'-এ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিপূর্ণতার দিকটি বিবেচনা করে সার্বজনীনভাবে ০ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানব সন্তানকেই শিশু বলে অভিহিত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন যেমন- ভোটাধিকার আইন, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, সংশোধিত শিশু আইন (খসড়া), সংশোধিত জাতীয় শিশু নীতি (খসড়া) সহ বিভিন্ন আইন ও নীতিতেও শিশুর বয়স ০ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকার ও মানবাধিকার:

- **অধিকার :** অধিকার হলো ন্যায্য পাওনা। এটি এমন একটি দাবী যা একজন অন্যজনকে ভোগ করতে দিতে বাধ্য। অর্থাৎ যা ন্যায্য পাওনা এবং এগুলো এমনিতেই পাবো, চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

মানবাধিকার:

- মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বোঝায় না, মানবাধিকার শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইনগত ও নৈতিক অধিকার গুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যে গুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে দাবী করতে পারে। এ অধিকার গুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এগুলো চিরন্তন এবং সার্বজনীন এবং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এ অধিকারগুলো নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

মানবাধিকার হলো এমন সব অধিকার যা মানুষ সহজভাবে, জন্মসূত্রে অর্জন করে। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে দাবী করতে পারে। এগুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়, বরং তা চিরন্তন ও সার্বজনীন। মানবাধিকার অহস্তান্তরযোগ্য ও অলংঘণীয়। এগুলো ছাড়া মানুষ প্রকৃত মানুষ হিসেবে বাচঁতে পারে না এবং ব্যক্তিত্বও বিকশিত করতে পারে না।

শিশু অধিকার :

- শিশুর স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য জন্মের পর থেকে জন্মসূত্রেই প্রতিটি শিশু যে সকল জিনিস বা সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তা একজন শিশুকে ভোগ করতে দেওয়াই হচ্ছে শিশু অধিকার। অর্থাৎ যা ন্যায্য পাওনা তা চাওয়ার প্রয়োজন নেই, সেগুলো এমনিতেই তোমাদের পাওয়ার কথা। যেমন- জন্মের পর না চাইলেও বাবা-মা বা অভিভাবকগণ প্রত্যেক শিশুর জন্য আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী খাদ্য (শাল দুধসহ মায়ের বুকের দুধ), বস্ত্র (তোয়ালে, পাতলা কাপড়, নতুন পোষাক) ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কিংবা একটু বড় হওয়ার পর শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।
- শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে শিশুদের বয়স ও বিকাশের দিকটি বিবেচনা করে। যেমন- খাবারের অধিকার পৃথিবীর সকল মানুষেরই রয়েছে কিন্তু একজন ২৫ বছর বয়সের মানুষ যা খেতে পারবে ০১ বছরের শিশু সেই খাবার খেতে পারবে না। এক্ষেত্রে ০১ বছরের শিশুর জন্য তার উপযোগী খাবার দেয়াটাই হচ্ছে ঐ শিশুর খাবারের অধিকার।

- *অধিকারের সাথে কর্তব্য অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একজনের অধিকার ভোগ করার সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য অন্যদের যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করতে হবে, যাতে নির্বিঘ্নে অধিকার ভোগ করতে পারে। অধিকার যখন প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় তখন ঐ অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়।*

শিশু অধিকার সনদ :

- **কেন শিশু অধিকার সনদ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়:** মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিশ্বের সব মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী, পুরুষ, শিশু সবাই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু শিশুরাই সবচেয়ে ঝুকিপুর্ণ ও পরনির্ভরশীল অবস্থায় বেড়ে উঠে। এ পরিস্থিতিতে শিশুকে যদি সমাজের বয়স্ক নারী-পুরুষের সাথে তুলনা করে অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে অনেক সময়ই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে। সঙ্গত কারণেই শিশুদের বয়স অনুযায়ী অধিকার নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ একটি আলাদা সনদ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই সনদটিতে শিশু অধিকারগুলো সুনির্দিষ্ট ভাবে উলে□খ করার পাশাপাশি এর গুরুত্ব এবং এই অধিকার গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণের কর্তব্যগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।
- *শিশু অধিকার সনদ* হলো জাতিসংঘ কর্তৃক তৈরি করা শিশুর অধিকারের একটি আন্তর্জাতিক দলিল। এই সনদ অনুযায়ী ***সকল শিশুকেই সমানভাবে অধিকার ভোগ করতে*** দিতে হবে।
- ***১৯৮৯ সালে*** শিশু অধিকার সনদটি তৈরি হয়েছে এবং সনদটি ***১৯৯০ সাল*** থেকে বাস্তবায়ন করা শুরু হয়েছে।
- আমাদের বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের নিকট এমনভাবে প্রতিশ্রুতি (সনদে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে) দিয়েছে যে বাংলাদেশ এখন শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আইনগতভাবে বাধ্য। উল্লেখ্য, শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।
- শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকারগুলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গভেদে সকল শিশুর জন্যই প্রযোজ্য, অর্থাৎ **বৈষম্যহীনভাবে শিশুদের অধিকার ভোগের সুযোগ** করে দিতে হবে।

শিশু অধিকার সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক :

- শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪ টি অনুচ্ছেদ/ধারা রয়েছে
- ১-৪১ নং পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোতে সরাসরি শিশুর অধিকারের কথা বলা আছে
- ৪২-৫৪ নং পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোতে শিশুদের অধিকারসমুহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারসহ অন্যান্যরা কী কী দায়িত্ব পালন করবে তা উল্লেখ করা হয়েছে
- ১-৪১ নং পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোকে চারটি গুচ্ছ/ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে-

ক) বেঁচে থাকার অধিকার : শিশুর বেঁচে থাকা বা জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অধিকারগুলোই মূলত শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার। যেমন, পুষ্টিকর খাবার, পরিবারে ও সমাজে শিশুর লালন-পালন ও যত্ন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানি, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি।

খ) বিকাশের অধিকার : বিকাশ হচ্ছে বর্ধন বা ইতিবাচক পরিবর্তন। শিশু শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য যে সকল অধিকারগুলো একান্ত জরুরী সেগুলোই হচ্ছে বিকাশের অধিকার। যেমন, প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া, শিক্ষা, চিন্তা, চেতনা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, নাম ও পরিচয়ের অধিকার, বিনোদন ও অবকাশ যাপনের অধিকার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি।

গ) সুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার: স্বাভাবিক অবস্থায় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় শিশু যাতে কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিংবা শিশুর সুরক্ষা বিঘ্নিত না হয় সেজন্য যে অধিকারগুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন সেগুলোই নুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার। যেমন, পার্থক্য বা প্রভেদ না করা, পাচার থেকে রক্ষা করা, গোপনীয়তা রক্ষা করা, নির্যাতন বা অবহেলা থেকে রক্ষা করা, পরিবারহীন শিশুর রক্ষনাবেক্ষন করা, দত্তক নেয়া, শিশুশ্রম থেকে রক্ষা করা, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা, যৌন নির্যাতন, শিশু অপহরণ, অন্যান্য নির্যাতন/শোষণ থেকে রক্ষা করা, অত্যাচার ও বঞ্চনা থেকে রক্ষা করা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, সশস্ত্র সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি।

ঘ) অংশগ্রহণের অধিকার : শিশু তার বয়স অনুযায়ী মত প্রকাশ ও খেলাধুলাসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের যে অধিকার তাই মূলত অংশগ্রহণের অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, মতামত ও মনোভাব প্রকাশের অধিকার, অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের অধিকার, নিজের অধিকার ও প্রয়োজনীয় তথ্য জানার অধিকার, বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি।

অধিকারের প্রত্যেকটি গুচ্ছ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত এবং একটি গুচ্ছের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে অন্য গুচ্ছের অধিকারগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

শিশু অধিকার সনদের মূলনীতি:

১. বৈষম্যহীনতা
২. শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ
৩. বেঁচে থাকা ও বিকাশের নিশ্চয়তা
৪. অংশগ্রহণ
৫. **দায়বদ্ধতা**

অধিকার ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য:

- আমাদের শিশুরা তাদের জীবনে স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য বা ভাল থাকার জন্য অনেক কিছুই অভিভাবক বা বাবা-মা'র কাছে চেয়ে থাকে। কিন্তু এরমধ্যে এমন কতগুলো চাওয়া বা প্রয়োজন রয়েছে যেগুলো ছাড়া শিশুরা স্বাভাবিকভাবে বড় হতে পারবে না, সেই চাওয়া বা প্রয়োজনগুলোই হচ্ছে শিশুদের অধিকার। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, বাবা-মায়ের কাছে লালিত-পালিত হওয়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

অন্যদিকে শিশুদের চাওয়া বা চাহিদা বা প্রয়োজনগুলোর মধ্যে এমন কতগুলো চাওয়া থাকে যেগুলো পেলে তারা আরও ভাল থাকবে কিন্তু না পেলেও কোন ক্ষতি বা সমস্যা হচ্ছে না সেই চাওয়াগুলোকে আমরা চাহিদা বলতে পারি। যেমন-**দুই সেট পোষাক আছে কিন্তু আরও এক সেট চাই, হেটে স্কুলে যাওয়া যায় কিন্তু সাইকেলে যাওয়ার জন্য সাইকেল চাই** ইত্যাদি। আবার এমন কতগুলো চাওয়া আছে যেগুলো আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে সেই চাওয়াগুলোকে অধিকার না বলে

শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষার সাথে অধিকারের সম্পর্ক :

- বিকাশ হচ্ছে বয়সের সাথে সাথে ইতিবাচক পরিবর্তন। একজন শিশু জন্মের পর হাঁটতে পারে না, সেই সময় তাকে হাঁটতে শেখানোই হচ্ছে তার একটি বিকাশের অধিকার।
- বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশের অধিকারের ধরনও পরিবর্তন হয়। যেমন- বয়ঃসন্ধিকালে (সাধারণত ১০ থেকে ১৯/২০ বছর) ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুরই শারীরিক ও মানসিক কতগুলো পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক।
- বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো কি কি, কখন হতে পারে, সেক্ষেত্রে করণীয় কি সে বিষয়ে জানাও শিশুর বিকাশের অধিকার। এই অধিকার যদি সঠিকভাবে কেউ পায় তাহলে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের ফলে যে ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সুরক্ষা বা নিরাপত্তা:

- প্রতিটি শিশুরই ভালভাবে বা স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য পরিবার, স্কুল, যাতায়াতের রাস্তা, ক্যাম্প বা সমাবেশ ও খেলাধুলার স্থানসহ সব জায়গায় সবধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অতি জরুরী।
- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার পাশাপাশি সকল প্রকার নির্যাতন (শারীরিক, মানসিক, অপছন্দনীয় আদর-আচরণ বা যৌন নির্যাতন) থেকে রক্ষা পাওয়াও শিশু অধিকারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- **সব ধরনের নির্যাতন বা নির্যাতনমূলক আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়াকেই বলা হয় সুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার।**
- অন্যদিকে জন্মের পর থেকেই স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য প্রয়োজন পরিবার ও তার পরিচিত পরিমন্ডলে সকল প্রকার নিরাপত্তা দেওয়া। এক্ষেত্রে খাদ্য, চিকিৎসার পাশাপাশি শিশুকে সকল প্রকার সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে তাদেরকে নির্যাতন (শারীরিক, মানসিক, যৌন) থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখতে হবে।
- বিকাশ ও সুরক্ষার বিষয়গুলোও শিশু অধিকারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অর্থাৎ বিকাশ ও সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত না হলে শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠতে পারবে না এবং শিশুর অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না।

নির্যাতন কী ও এর ধরনসমূহ:

নির্যাতন, নির্যাতনকারী এবং নির্যাতনের জন্য শিশুকে বশে আনার কৌশল:

- বড়দের যে আচরণ বা কথা বা স্পর্শ বা কাজ বা উদ্যোগ শিশুদেরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত বা কষ্ট দেয় তাই *নির্যাতন।*
- **শারীরিক নির্যাতন:** হাত দিয়ে বা কোন লাঠি বা কাঠি (কঞ্চি, বেত) দিয়ে বা কোন ধারালো যন্ত্র/অস্ত্র (দা, কাঁচি, খুন্তি) বা অন্য কোন কিছু ব্যবহার করে শরীরে যেকোন ধরনের আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়াই হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন।
- **মানসিক নির্যাতন:** গালি দিয়ে, অশ্লীল কথা বলে, অপমান বা অবমাননা করে, বিকৃত নামে ডেকে, চাকরি (বাড়িতে বা অন্যকোন জায়গায় যে শিশুরা কাজ করে) থেকে বাদ দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বা অন্য যেকোন ভাবে মানসিক আঘাত বা কষ্ট দেয়াকেই বলা হয় মানসিক নির্যাতন।

কোন শিশুরা নির্যাতনের শিকার হতে পারে: পরিবারে বসবাসকারী শিশু (ধনী-গরীব), শ্রমজীবী (বাড়িতে, দোকানে, কারখানায়, গ্যারেজ/ওয়ার্কশপে, গাড়িতে যারা কাজ করে) শিশু, রাস্তায় বসবাসকারী শিশুসহ *যেকোন বয়সের যেকোন শিশুই নির্যাতনের শিকার হতে* পারে।

কোথায় নির্যাতনের শিকার হতে পারে: পরিবার, স্কুল, প্রতিবেশী বা আত্মীয় বাড়ি, কর্মস্থল (যে শিশু যেখানে কাজ করে), যাতায়াতের রাস্তা, খেলাধুলার জায়গা, ক্যাম্প বা সমাবেশসহ যেকোন জায়গায়ই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হতে পারে।

কারা নির্যাতনকারী:

- আমাদের সমাজে অধিকার বাস্তবায়নের সাথে যেমন বড়রা সম্পৃক্ত তেমনি শিশুদের কষ্ট দেয়া বা নির্যাতনের ঘটনার সাথেও সাধারণত বড়রাই জড়িত এবং যে কোন বয়সের শিশুরাই নির্যাতনের শিকার হতে পারে। এই নির্যাতনকারীরা পরিচিত, আত্মীয়-স্বজন এমনকি পরিবারের সদস্যও হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে *সব বড়রাই শিশু নির্যাতনকারী নয়*। অন্যদিকে, *নির্যাতনকারী পরিচিত বা অপরিচিত উভয়ই হতে পারে* । তবে পরিচিতরাই যেহেতু শিশুর কাছাকাছি থাকে সেজন্য তারাই বেশি নির্যাতন করার সুযোগ পায়।
- *শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি* শিশু নির্যাতনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন কৌশলে শিশুদের যৌন নির্যাতন (অশ্লীল কথা বলে বা অঙ্গভঙ্গি করে, আদরের ছলে বা জোর করে জড়িয়ে ধরে বা ধরার চেষ্টা করে এবং চুমু দিয়ে বা চুমু দেয়ার চেষ্টা করে, লজ্জাস্থানে হাত দিয়ে বা চেষ্টা করে, খারাপ ছবি দেখিয়ে (কাগজে বা মোবাইলে বা ইন্টারনেটে), কিংবা সম্পূর্ণরূপে যৌন কাজ করার চেষ্টা করে।
- *শিশুদেরকে বশে আনার জন্য পরিচিত বা অপরিচিত নির্যাতনকারীরা* সাধারণত মজার মজার জিনিস দেয়ার লোভ দেখায়, বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে, প্রেমের প্রস্তাব দেয়, পড়া বুঝিয়ে দেয়ার অজুহাত দেখায়, পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর দেয়ার লোভ দেখায়, আদর করার ভান করে, ভয় দেখায় বা জোর করে এবং শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন করে থাকে।

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে অভিভাবকদের করণীয়:

- **বিশ্বাস করা :** শিশুর অধিকার সম্পর্কে সকলকেই জানাতে হবে, যাতে তারা শিশু অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারে। তবে এর *পাশাপাশি শিশুরা পরিচিত বা অপরিচিত উভয়ের দ্বারাই শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে এ বিষয়টিও বিশ্বাস করতে হবে*। নিজেকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে, তেমনি পরিবারের সকল সদস্যকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। পরিবারের সবাই জানবে শিশুর উপর এ ধরনের নির্যাতন অতি নিকটজনও করতে পারে ভেবে সবাই সাবধান থাকবে। অন্যদিকে নির্যাতনকারী বিশেষত পরিচিত নির্যাতনকারী যখন বুঝবে এ পরিবারের সবাই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন আছে তখন সে এ ধরনের নির্যাতন করতে ভয় পাবে। কারণ পরিচিত নির্যাতনকারীরা নিজেদের সামাজিক অবস্থানে নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না।

- **সাবধানতা:** শিশুকে এমন কারো কাছে একাকী রাখা যাবে না, যার সম্পর্কে আমি পুরোপুরি জানি না। একটি শিশু কাকে পছন্দ করছে সে দিকও দেখতে হবে। তার অপছন্দনীয় কারো সাথে অবস্থানের জন্য শিশুকে জবরদোস্তী করা যাবেনা। শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। অন্যদিকে, আপনার শিশু বা আপনার দায়িত্বে থাকা শিশু কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের বেশি সময় ধরে বিনা অনুমতিতে কোথাও অবস্থান করছে কিনা, কোনো প্রলোভনের শিকার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। শিশুর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, শিশু যেন

- *ভাল ও মন্দ আচরণ বা স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য* করতে সহযোগিতা করা : অভিভাবক হিসেবে আপনি যদি শিশুকে সব সময় শারীরিক ভাবে আঘাত করেন বা গালমন্দ বা অবমাননা করেন কিংবা আদরের ছলে তার ব্যক্তিগত অঙ্গে স্পর্শ করে আদর (চুমু দেয়া, অযথা কোলে নিয়ে জোরে চাপাচাপি করা, যৌনাঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করা) করেন, তাহলে শিশু আপনার এবং নির্যাতনকারীর নির্যাতনমূলক আচরণকে আলাদা করতে পারবে না। অভিভাবককে প্রথমে শিশুর সাথে ভাল আচরণ করতে হবে যাতে সে ভাল ও মন্দ আচরণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং অভিভাবকদের জানাতে পারে। আপনার ইতিবাচক আচরণ *ভাল ও মন্দ আচরণ বা স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য* করতে শিশুদেরকে সহযোগিতা করবে। একইসাথে শিশুকে 'না' বলতে **শিখাতে হবে। পরিচিত বা অপরিচিত যে কোন ব্যক্তিই যদি শিশুর সাথে মন্দ আচরণ করে কিংবা করার চেষ্টা তাহলে শিশুকে জোরে 'না' বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।**

- এলাকার সবাইকে সচেতন করা এবং সচেতন করার পরিবেশ তৈরি করা: নিজে একা শিশু অধিকার ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতন হলে চলবে না। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের সকলের সচেতনতার পাশাপাশি অংশগ্রহণ অতি জরুরী। এলাকায় প্রতিবেশীর শিশু যেমন আপনার বাসায় আসবে তেমনি আপনার শিশুও প্রতিবেশীর কাছে যাবে। সুতরাং এ বিষয়টি সম্পর্কে নিজে সচেতন হবার পাশাপাশি এলাকার সবাইকে সচেতন করতে হবে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে শিশুদের সুরক্ষার জন্য কাজ করতে হবে।

- শিশুকে শরীরের সীমানা সম্পর্কে ধারণা দেয়া : **শিশুদেরকে তাদের শরীরের সীমানা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের সীমানা রক্ষায় উদ্যোগী হয়। শিশুদেরকে এভাবে তথ্য দেয়া যেতে পারে যে,** আমাদের দেশের যেমন সীমানা রয়েছে তেমনি স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সীমানা বা প্রাচীর রয়েছে। এই সীমানাগুলো পাহারা দেয় বর্ডার গার্ড-বাংলাদেশ, পুলিশ কিংবা দারোয়ান। তেমনি আমাদের প্রত্যেকেরই শরীরের সীমানা রয়েছে এবং এই সীমানা নিজেকেই রক্ষা করতে হবে। নিজেকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করে সুরক্ষিত রাখতে হলে এই সীমানার মধ্যে এসে কেউ যদি কোন খারাপ আচরণ বা স্পর্শ করার চেষ্টা করে তাহলে নিজেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

দুই হাত দিয়ে তৈরি ত্রিভূজ আকার,
সেইতো শরীরের সীমানা সবার।
কিংবা
মন্দ আদর রুখবো, নির্যাতন বুঝবো,
সীমানায় হাত বাড়ালে বাঁচার উপায় খুঁজবো।

- সুরক্ষা শিক্ষাকে পাঠ্যপুস্তকে আনার জন্য সর্বস্তর থেকে দাবি ওঠানো: পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারলে সকল প্রকার শিশু নির্যাতন বিষয়ক আলোচনা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কারণ এ শিক্ষার মধ্যদিয়ে শিশুর জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং শিশু তার বয়স অনুযায়ী অধিকার, নির্যাতন ও সুরক্ষা সম্পর্কে তথ্য পাবে। জীবন দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে রক্ষায় করণীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। কেউ তার স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত দিলে, অবমাননা করলে কিংবা শারীরিকভাবে আঘাত করলে অতি সহজে সে বিষয়টি বড়দের বলতে পারবে।

নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য করণীয়:

- সব ধরনের কৌশল অবলম্বনের পরও কিংবা কৌশলগুলো সম্পর্কে শিশু ও অভিভাবকগণ না জানার কারণে যদি কোন শিশু নির্যাতনের শিকার তাহলে তার জন্য সবাই মিলে সব ধরনের সহায়তার (মানসিক সান্ত্বনা দেয়া, চিকিৎসা করা, প্রয়োজনে বড়দের মাধ্যমে আইনের সহায়তা নেয়া) ব্যবস্থা করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার শিশু ও তার পরিবারের সদস্যদের বুঝাতে এ ঘটনার জন্য শিশুটি নয় বরং নির্যাতনকারীই দোষী। এভাবে বলা যায়-

যদি হয় কোন শিশু নির্যাতনের শিকার,
নির্যাতকই আসল দোষী, নয়তো শিশু আর।

- শিশুর প্রতি যেকোন ধরনের নির্যাতনই সামাজিক ভাবে ও আইনের দিক থেকে অপরাধ ও খারাপ কাজ
- সর্বোপরি বলা যায়, এই তথ্যগুলো শুধু নিজে জানলেই হবে না তা আমাদের স্কাউটারসহ অন্যান্য বন্ধু ও ছোটদেরকেও জানাতে হবে, যাতে সকলে মিলে শিশুর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আর শিশুদেরকে যেকোন (ভাল বা খারাপ) বিষয়েই বাবা-মা বা অভিভাবকদের সাথে বিনা সংকোচে আলোচনা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে উপর্যুক্ত তথ্যগুলো শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য কাজে লাগাতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর (শিশুর প্রতি বড়দের আচরণ যেমন হবে) প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে-

- শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে সে সাধারণত জেদী হয় না
- শিশুর মতামত ধৈর্য সহকারে শুনে তাকে সঠিকভাবে বোঝালে সে ঠিক বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করে
- শিশুকে মিথ্যা বলার জন্য তিরস্কার না করে বুঝিয়ে বললে সে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকে
- শিশুকে বোঝাতে হবে খেলার সাথে সাথে তাকে পড়াশোনা কেন করতে হবে
- শিশুর প্রতি কোন রকম কঠিন আচরণ করার আগে নিজের শিশুবেলার কথা স্মরণ করতে হবে
- সকল শিশুর প্রতি আচরণ একই রকম করতে হবে
- শিশুর কোন কাজ সম্পর্কে সরাসরি সমালোচনা না করে তাকে ভালো মন্দ দিক সম্পর্কে বলতে হবে
- আপনার মানসিক কোন চাপ থাকলে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন আপনি তার কথাগুলো পরে শুনতে চাচ্ছেন
- স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে শিশুর মনকে জয় করাই সবচেয়ে সহজ পথ
- শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে, সুতরাং বড়রা এমন কোন আচরণ করবেন না যাতে খারাপ আচরণটি দেখে শিশুটি ঐ আচরণ নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়
- লেখাপড়া, খেলাধুলা, বিশ্রাম, আদর-যত্ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের উৎসাহিত করতে হবে
- যে কোন ধরনের শারীরিক, মানসিক ও অবমাননাকর শাস্তি শিশুর বিকাশের অন্তরায়
- শিশুকে দায়িত্ববান করার জন্য তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং তার মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।